ফালসাফায়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)

(শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর দর্শন)

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

ফালসাফায়ে
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ)

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

ফালসাফায়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশক: গ্রন্থকার
প্রকাশকাল: মে, ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: অগাষ্ট, ২০২০

প্রচ্ছদ: দি কাসওয়া কম্পিউটার
মুদ্রণ: দি কাসওয়া কম্পিউটার

মূল্য: ১০০ টাকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বক্ষমাণ গ্রন্থ পুরোপরি মৌলিক না হলেও এতে রয়েছে এমন সব বক্তব্য যা মূল কিতাব হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে নেই। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ:) এর অমর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শাহ সাহেব (রহ:) ইসলামের মৌলিক বিধানাবলির গূঢ় রহস্য উদঘাটন করত: বিশ্ববাসীর বিরাট উপকার করেছেন। শাহ সাহেব (রহ:) সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের মোজাফফরনগর জেলার ভুলাত-এ।

অতি শৈশব থেকে সাধনাপ্রবণ এই মনীষী বিশ্ববাসীর জন্যে রেখে গেছেন অসংখ্য অমর গ্রন্থ যার পাঠ আজও অতি প্রাসঙ্গিক। প্রকৃত সত্য হলো ভারতে হাদীস শাস্ত্রের প্রারম্ভিকা তার হাতেই। তাসাউউফের দৃঢ় ভিত্তি ভারতে রচিত হয় তার হাতেই। তার চার পুত্রের সাধনায় ভারতে দীন ইসলামের যে দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছে তার উপর দিয়েই আমাদের ইসলাম সাধনা।

যাহোক বক্ষমাণ গ্রন্থটি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের মূল ১১টি অধ্যায়ের সমাহার। অধ্যাপক আখতার ফারুকের অনুবাদের সাহায্যে আমি এ গ্রন্থটি রচনা করেছি। মূল অনুবাদটি ততটা যুতসই তো নয়ই এমনকি অনেক স্থানে তা মূল ভাবটি ধরে রাখতে পারেনি।

এজন্যেই আমি বক্ষমাণ গ্রন্থের কাজের প্রেরণা পেয়েছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আখতার ফারুক সাহেবের বই থেকে এ বই আলাদা।

কতটুকু সফল হয়েছি এরূপ একটি অতি উচ্চাঙ্গের বইয়ের সারসংক্ষেপ তৈরিতে তা আল্লাহই জানেন। তবে একজন পাঠকও যদি এ থেকে উপকৃত হন তবে আমি আমার শ্রম প্রতিদান পেয়েছে বলে ধরে নেব।

বইতে অনেক ব্যাখ্যা, যা আমার নিজস্ব, সন্নিবেশিত হয়েছে । ফলে বইয়ের মূল ভাব শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) এর, যার ভাষ্য নেয়া হয়েছে আখতার ফারুক সাহেবের অনুবাদ থেকে এবং পরিবেশন করেছি আমি। ভুলত্রুটির দায়ভার আমার জন্যে রইলো। সকল কৃতিত্ব শাহ সাহেব (রহঃ) এর এবং আখতার ফারক সাহেবের। তবে তৌফিক দেনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ আমার শ্রমকে কবুল করুন এবং যারা এ বই পাঠ করবেন এবং উপকৃত হবেন তাদেরকে মোবারকবাদ।

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ:) তাঁর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শরিয়তের বিধি নিষেধের রহস্য ও সেগুলোর কল্যাণকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে আদি সৃষ্টি; সৃষ্টি থেকে সৃষ্টি ও কার্যকারণ রীতির সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

শাহ সাহেব (রহ:) এর মতে আল্লাহতায়ালা গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টির বিষয়ে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে আল্লাহ অনস্তিত্ব থেকে বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন। অর্থাৎ কোন উপাদান বা নমুনা ছাড়াই আল্লাহ শূন্য থেকে বস্তুর সৃষ্টি ও তার পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

ব্যাখ্যা: হযরত রাসুলে মকবুল (সা:) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করায় তিনি (সা:) জবাব দিয়েছিলেন যে, আদিতে কেবল স্রষ্টাই ছিলেন, অন্য কেউ ছিলোনা। আমার অভিমত হলো- সেই আদি অবস্থায় সমগ্র জগত ছিল আল্লাহর সত্তাগত নূরে উদ্ভাসিত। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি ছাড়া তখন আর কিছু জগতে ছিল না। সে সময়ে আল্লাহ নিজের জন্য 'বাদিউ' নাম পছন্দ করলেন এবং সেই নামের চাহিদা হলো বিনা নমুনায় সৃষ্টি করা। তাই তিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করলেন- তার আরশ ও পানি। তখন তার আরশ ছিল পানির উপর। দেখুন, সূরা হুদের ৭ম আয়াত। "And it is He who created the heavens and the earth in six days- and His throne had been upon water- that He might test you as to which of you is best in deed." (Al-Quran, 11:7).

তাই বলা যায়, আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কোন নমুনা ছাড়া হয়েছিল। কারণ সিংহাসন ব্যবহার করে রাজাগণ। কিন্তু তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ছিল না বা কোন সিংহাসনও ছিল না। আর পানি মানুষ ও অপরাপর জীবের জীবনের প্রধান উপাদান এবং সকল প্রাণবন্ত জীবের পিপাসা নিবারণকারী। কিন্তু তখন কোন প্রাণ ছিল না যে পানির প্রয়োজন পড়বে কিংবা কোন প্রাণ তখনও সৃষ্টি হয়নি যে- পানি দ্বারা তার দেহ তৈরী হবে। দেখুন, সূরা আম্বিয়ার ৩০নং আয়াত। আল্লাহ বলেন,

"Have those who disbelieved not considered that the Heaven and the earth were a joined entity, and we separated them and made from water every living thing; Then will they not believe ?." (Al-Quran, 21:30).

তাই বলা যায় জগত সাত আসমান বিশিষ্ট ও সমসংখক পৃথিবী বিশিষ্ট এবং আল্লাহ ছয় মহাকাল ব্যবহার করে আসমান ও জমিনের পূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহ সৃষ্টি করার পূর্বে কোন আসমান ছিল না বা পানিও ছিল না। আল্লাহ বিনা নমুনাতে এসব সৃষ্টি করেছেন। দার্শনিকদের পরিভাষায় একে বলা হয়, "Creatio originan" অর্থাৎ আদি ও নমুনা ছাড়া সৃষ্টি।

এই গেলো সৃষ্টি জগত সৃষ্টিতে আল্লাহর প্রথম পন্থা। তবে আরো এগিয়ে বলা যায়- আল্লাহ আসমান ও জমিনকে পৃথক করার বিষয়টি উল্লেখ করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন এবং আমরা বর্তমানে দেখছি- মহাবিশ্বের শুরু একটি মহাবিস্ফোরণে যাকে Big Bang বলা হয়। এটি ঘটেছিল মোটামুটি ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে। তখন জগতের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থগুলো যথা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও তাদের সমন্বয়ে সরল কিছু অনু যথা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি সৃষ্টি করেন আল্লাহ। অত:পর ছয়টি মহাকালব্যাপি আল্লাহর সৃষ্টি চলতে থাকে এবং সকল সৃষ্ট বস্তুই তখন বিনা নমুনাতে তৈরী করেন আল্লাহ। এই ছয় মহাকালে আল্লাহর গুণগত নাম "বাদিউ" ক্রিয়াশীল ছিল।

অত:পর আসে আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ক দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে আল্লাহ নিজের জন্য "খালিক" নাম পছন্দ করেন এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া চালাতে থাকেন। এই পর্যায় সম্পর্কে শাহ সাহেব (রহ:) বলেন, "তিনি এক সৃষ্টি থেকে অন্য সৃষ্টির পত্তন করলেন।"

এ পর্যায়ে ভারী মৌলিক পদার্থগুলো সরল ও হাল্কা মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ। এখানে নমুনাবিহিন সৃষ্টির বিষয়টি অনুপস্থিত। কারণ, সকল অণুই একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ অনুসরণ করে। যেমন, হাইড্রোজেনে থাকে ১টি প্রোটন ও ১টি ইলেকট্রন। হিলিয়ামে থাকে ২টি প্রোটন, ২টি নিউট্রন ও ২টি ইলেকট্রন। এমনভাবে বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, বোরন, কার্বণ, হয়ে গোল্ড, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাকার মৌলিক অণু সবই একই প্যাটার্ণ অনুযায়ী তৈরী হয়।

এসব ভারী অণু থেকে তৈরী হয় বড় বড় বস্তু। যেমন, মাটি, বালি, পিতল ইত্যাদি যেগুলো পৃথিবীতে বর্তমানে দেখা যায়। অন্যদিকে রয়েছে শক্তি। শক্তিও মৌলিক সৃষ্টি। এটি অর্থাৎ আগুন তৈরী হয় যখন পদার্থকে পুড়ানো হয়। তখন শক্তি নির্গত হয় আর সেই শক্তিই আগুন। এই গেলো শাহ সাহেব (রহ:) বর্ণিত এক সৃষ্টি থেকে অন্য সৃষ্টির পত্তন।

এ সকল সৃষ্ট বস্তু তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণ থেকে পৃথক হতে পারে না। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণী তার বৈশিষ্ট্যসহ পৃথিবী বা অন্যত্র বিরাজ করে। দেখুন, সূরা তোয়াহার ৪৯ ও ৫০ আয়াতদ্বয়।

আল্লাহ বলেন, "(Pharaoh) said, "So, who is the Lord of you two, O Moses? He said, "Our Lord is He who gave each thing its form and then guided (it)." (Al-Quran, 20:49-50).

পাঠক বুঝতে পারছেন যে, শাহ সাহেব (রহ:) ঠিকই লিখেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে তার অবয়ব দান করেছেন এবং অত:পর দিয়েছেন সেই বস্তুর জীবন চলার মত দিক নির্দেশনা যাকে আমরা বলছি বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এই গুণের মধ্যে দুটি বিভাগ রয়েছে।

(১) সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও (২) বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

একটি উদাহরণ দেই। পানি ও বরফ। পানির যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা হলো এটি ১টি অক্সিজেন পরমাণু ও ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। বরফও তাই। কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয় ও ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। আর বরফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যদিও এটি পানিই বটে কিন্তু এর ঘনত্ব পানির চেয়ে কম।

আরেকটি উদাহরণ দেই। সকল মানুষ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। কিন্তু নবীগণ (আ:) কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন।

এই গেলো শাহ সাহেব (রহ:) বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের ১ম ও ২য় পর্যায়ের আলোচনার সার নির্যাস। তৃতীয় পর্যায়ে সৃষ্টিতে যোগ হয় কার্য-কারণ রীতি। এর উল্লেখ আল্লাহ করেছেন সূরা তোয়াহার ৫০ নং আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, "Our Lord is He who gave each thing its form and then guided [it]."

আল্লাহর দেয়া guidance বা দেখানো পথ বলতে শাহ সাহেব (রহ:) লিখেছেন, "এ রীতিতে প্রতিটি সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মে দেখা দেয় এবং যে সৃষ্টি থেকে তিনি যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তা সে গুণ নিয়েই দেখা দেয়। যেমন, আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়, তাই আগুনের ধর্ম হলো পোড়ানো। বৃষ্টির জন্য উর্ধ্বাকাশে মেঘ বিচরণ করে। বৃষ্টির দ্বারা উদ্দেশ্য মাটিকে ফল ফসল উৎপন্নের যোগ্য করা। ফল ফসল উৎপন্নের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য জীবজগত প্রতিপালন। ফল ফসলের মধ্যে সেই গুণ রয়েছে। এরা জীবকে পুষ্টি দেয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বিষয় কার্য কারণের রীতিতে দেখা দেয়। অর্থাৎ Cause and effect। তাই এই

দুনিয়াকে বলা হয় দারুল আসবাব। অর্থাৎ আসবাব বা কারণ ছাড়া কোনো ঘটনা ঘটে না। এমনিভাবে নবী-রাসূল প্রেরণের পেছনেও কার্য-কারণ রীতির দেখা মেলে। যখন পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর মনোনিত বান্দা বা নবী আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভ করেন এবং সে অনুযায়ী লোকদেরকে আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের বিধানটি জানিয়ে দেন।

কার্য কারণের রীতির একটি অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে সেটি এই যে, সৃষ্টির ভেতরেই আরেক সৃষ্টির সম্ভাবনা রেখে দেয়া হয়। অন্য কথায় একই সৃষ্টির ভেতর দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ থাকে। যেমন, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাকার মৌলিক কণার দুটি পরস্পর অসামঞ্জস্যশীল গুণ দেখা যায়। এরা একাধারে তরঙ্গধর্মী ও কণাধর্মী। কণার ধর্ম একটি স্থানে তাকে দেখা যায় আর তরঙ্গের ধর্ম হলো একস্থানে সে থাকে না বরং বিরাট এলাকায় বিস্তৃত থাকে এর অস্তিত্ব। তাই বলা যায়- মৌলিক কণাদের রয়েছে পরস্পর বিরোধী দুটি ধর্ম। যখন যে ধর্ম তালাশ করা হবে- তখন সেই ধর্মই পাওয়া যাবে। আর এই দুটি ধর্ম কখনো কখনো সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় নতুন অন্য বস্তুও সৃষ্টি হয়। যেমন, প্রোটন বা নিউট্রন ক্ষয় হয়ে নতুন বস্তু নিউট্রিনো সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়ও। এই ক্ষয় প্রক্রিয়া প্রোটন বা নিউট্রনের পরস্পর বিরোধী দুটি ধর্মের মধ্যে সংঘাতের ফলেই উদ্ভূত হয়। নতুন সৃষ্টি নিউট্রিনো কার্যকারণ রীতির ফলে দেখা দিতে পারে বা কার্যকারণ রীতির বাইরের কোন কিছুর কারণেও এটি উদ্ভূত হতে পারে।

দার্শনিকদের পরিভাষায় একে বলা হয়- “dialectism” বা দ্বন্দ্ব। তাদের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত হলো বিশ্ব দেখা দিয়েছে dialectic materialism এর মাধ্যমে। অর্থা বস্তুনিচয়ের মধ্যে সংঘাতের ফলে নতুন নতুন সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টিজগত এভাবে বৈচিত্রপূর্ণ হয়েছে। তাদের মতে আল্লাহ বলে কোন ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই dialectic materialism এর মাধ্যমে জগতের শুরু, চলা ও সমাপ্তি।

অত:পর শাহ সাহেব (রহ:) কার্য কারণের রীতির উপর আল্লাহ তায়ালার হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার শুরুটা এমন। কোন বস্তু কল্যাণকর উদ্দেশ্যে সৃজিত হলো। এই কল্যাণকর উদ্দেশ্য সর্বদা কল্যাণকর হয়ে দেখা নাও দিতে পারে। অথবা যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে বস্তুটির সৃষ্টি সেই কল্যাণকারিতার ধর্ম বস্তুটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। অথবা বস্তুটির সৃষ্টিতেই কোন কল্যাণের উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি থাকতে পারে। যখন এ ধরণের মন্দ দেখা দেবার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই সৃজনী শক্তিগুলোর ও বস্তুনিচয়ের উপর ‘কবজ’, ‘বাসাত’, ‘ইহালা’, ও ‘ইলহামের’ মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করেন এবং সেগুলোকে উদ্দেশ্যে অনুসারে পরিচালিত করেন।

'কবজ' অর্থ হরণ। যেমন, ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুন পোড়ায়নি। কারণ, আল্লাহ আগুনের পোড়াবার শক্তি হরণ করেছিলেন।

'বাসাত' অর্থ অস্বাভাবিক। অনেক সময় কোন বস্তু বা মানুষ এমন কাজ করে যা স্বাভাবিক নয়। আল্লাহই এই অস্বাভাবিক অবস্থার স্রষ্টা।

'ইহালা' অর্থ অলৌকিক। যেমন, শত্রুদের অস্বাভাবিক দাবী পূরণ করার জন্য রসূলে মকবুল (সাঃ) এর অঙ্গুলী হেলনে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

'ইলহাম' অর্থ অবতীর্ণ জ্ঞান। হযরত খিজির (আঃ) ও মূসার (আঃ) ভ্রমণ বৃত্তান্ত এর উদাহরণ। নৌকা ভেঙ্গে দেয়া, ছেলেটিকে হত্যা করা, দেয়াল সংস্কার করে দেয়া, এসব কাজ খিজির (আঃ) দিব্যজ্ঞান বা ইলহামে প্রাপ্ত জ্ঞানের নির্দেশে করেছেন। নবীদের উপর গ্রন্থ ও বিধি বিধান অবতীর্ণ হওয়া ইলহামের অন্তর্ভূক্ত। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ইলহাম লাভ হতে পারে। কখনো প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যেরও ইলহাম হতে পারে।

অত:পর শাহ সাহেব (রহ:) বলেন, "কুরআন পাকে কার্য কারণের রীতির এতসব শ্রেণী ও ধরণের বর্ণনা রয়েছে যা অতিক্রম করা কখনোও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলম-ই-মিছাল
বা
স্বরূপ জগত

এই অধ্যায়ে শাহ সাহেব (রহ:) বস্তু ও বিষয়সমূহের দুটি জগত উন্মোচন করেছেন। একটি জগত তো এটিই যাতে আমরা এখন আছি। আরেকটি জগত হলো আলম-ই-মিছাল বা স্বরূপ জগত। এই জগতে কোন কিছুই, হোক সেটি 'Abstract' বা ধারণাগত বিষয় বা প্রকৃত বস্তু, একটি রূপ পরিগ্রহ না করে থাকে না। যেমন, নামায, রোজা এগুলো বিষয়। এই বিষয়গুলোও স্বরূপ জগতে একটি রূপ পরিগ্রহ করে। এমন নয় যে, সকলের নামায একত্র হয়ে একটি রূপ নেয়। বরং একজনের এক ওয়াক্তের নামায একটি রূপ নেয়, অন্য ওয়াক্তের নামায অন্য একটি রূপ নেয়। তেমনি রোযাও। একেকদিনের রোজা একেক রূপ নেয়। এবং এই রূপই ধর্তব্য। কারণ এই রূপটি আল্লাহ তায়ালার কাছে গচ্ছিত বান্দার আমল।

এবার বস্তুর প্রসঙ্গে আসি। বস্তু, হোক তা বড় বা ছোট, তার অবস্থানের দুটি স্থান রয়েছে। একটি হলো এই জগত যা আমরা দেখছি। আরেকটি হলো অদৃশ্য সম্ভাবনার জগত। সম্ভাবনার জগতে যে রূপ বাস্তব জগতে সে সেই রূপ পায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো- মৌলিক কণাদের আচরণ এমন যে, এরা অধিকাংশ সময় সম্ভাবনার জগতে তথা অদৃশ্যে অবস্থান করে, যখন দৃষ্ট হবার জন্য কেউ চেষ্টা নেয়, তখনই কেবল ওরা দৃষ্ট হয়। শাহ সাহেব বর্ণিত স্বরূপ জগত আর আমার উত্থাপিত সম্ভাবনার জগত মূলত একই।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেন এবং পরে বলেন 'যাও আত্মপ্রকাশ করো'। তখনই সে কেবল সৃষ্ট বর্তমান জগতে বা দৃশ্যমান জগতে পদার্পন করে। অদৃশ্যে সৃষ্টি করার বিষয়টিই বলে যে, একটি জগত আছে যা দৃষ্টির অগোচর। সেটি এক অর্থে আলম-ই-মিছাল, অন্য অর্থে সম্ভাবনার জগত। যা কিছু সম্ভব- তার সবই সম্ভাবনার জগতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন-তখন সুপ্তি থেকে জেগে বস্তুটি রূপ নেয়। কিন্তু সেই রূপটি আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্যে রূপ নেয়া। আমরা সেটিকে তখন দেখিনা। যখন আল্লাহর আদেশ হয় ও সেটি বর্তমান দৃশ্যমান জগতে আসে তখনই কেবল আমরা সেটিকে দেখতে পাই।

আলম-ই-মিছালের অস্তিত্ব ও কর্মকান্ড সম্পর্কে শাহ সাহেব (রহ:) অত:পর অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) তিনি (সাঃ) বলেন, "সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কেয়ামতের দিন দু' খন্ড মেঘ বা দুটো ছাতা বা দু'ঝাক পাখির মত ছায়া হয়ে আসবে এবং তারা তাদের পাঠকদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে।

(২) তিনি (সাঃ) বলেন, "হাশরের মাঠে পাপ ও পূণ্য দেহ ধারণ করে দাড়িঁয়ে যাবে। পূণ্যবানকে সুসংবাদ জানাবে পূণ্য এবং পাপ পাপীকে বলবে পালাও, পালাও। কিন্ত পাপী তখন পালাবার পথ পাবে না।"

(৩) তিনি (সাঃ) বলেন, "যখন বিপদ অবতীর্ণ হয়, তখন দোয়া তার সাথে লড়াই করে এবং ঠেকিয়ে রাখে।"

(৪) অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কথা হলো- তিনি (সাঃ) বলেন, "মৃত্যুকে দুম্বার রূপ দিয়ে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে জবাই করা হবে।"

(৫) হাদীসে প্রমাণ মিলে, কেয়ামতের দিন হাশরে উপনীতদের আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রূপে নিজ জ্যোতি প্রদর্শন করাবেন। এও আছে, 'মহানবী (সাঃ) যখন আল্লাহর সমীপে যাবেন, তখন তিনি কুরসীর উপর উপবিষ্ট থাকবেন। আরও আছে, আল্লাহ পাক বনী আদমের সাথে সামনা সামনি কথা বলবেন।

সুতরাং যে জগতে আমরা বর্তমানে আছি তা-ই কেবল অস্তিত্বশীল জগত নয়। এর বাইরেও রয়েছে স্বরূপ জগত, অদৃশ্য জগত বা সম্ভবনার জগত। যখন কোন কিছু রূপ নেয়- তখন তা অদৃশ্য বা সম্ভবনার জগতে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। যখন আল্লাহ বলেন 'হও' তখনই সে 'হয়ে যায়' এবং হয় সে দৃশ্যমান এই জগতে চলে আসে বা আলমে মিছালে অবস্থান করে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ এবং শাহ সাহেব (রহ:) ও আমার কথা যা লিখা হলো তা পড়ে পাঠকের তিনটি অবস্থার যে কোন একটি হবেই।

(১) হয় কেউ এর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করবে। ফলে স্বরূপ জগত ও সম্ভাবনার জগত তাকে মেনে নিতে হবে।
(২) কেউ হয়তো বলবে, আসলে এসবের কোন ভিত্তিই নেই।
(৩) কেউ হয়তোবা বলবে, এসব হাদীস ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্যরূপ তাৎপর্য রয়েছে।

সেসব তাৎপর্য স্পষ্ট করতে না পারার দরূন এরূপ হাদীস ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ যদি কোন কাফেরের কবর উন্মুক্ত করে এবং কবর আযাবের কোন লক্ষণ না দেখে, তবে সে বলবে- চোখে দেখা বিষয়ের বিপরীত কথাকে কি করে সত্য বলে মেনে নিব?

এর জবাব হল এই, এ ধরনের কথা মানতে গেলে মানুষের তিনটি অবস্থা দেখা দেয়। প্রথম অবস্থাটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও সমর্থনযোগ্য। তা হল এই, এসব কথা মূলত: সত্য। নি:সন্দেহে অজগর সাপ মৃত কাফেরকে দংশন করে ছিন্ন ভিন্ন করছে। এ ঘটনা পারলৌকিক ঘটনার অন্তর্ভূক্ত। আর পারলৌকিক সব ঘটনা আত্মিক ও অপার্থিব। যেমন, জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর সাথে দেখা করতেন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁকে দেখতেন কিন্তু কোন সাহাবী জিব্রাইল (আঃ) কে দেখতে পেতেন না। তথাপি তারা বিশ্বাস রাখতেন যে, মহানবী (সাঃ) যথার্থই জিব্রাইল (আঃ) কে দেখেন। এখন আপনারা যদি রসূল (সাঃ) এর হাদীসগুলো অবাস্তব বলে মনে করেন তবে তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমণ ও ওহী অবতীর্ণ হবার কথা কি করে বিশ্বাস করবেন?

দ্বিতীয় অবস্থার মানুষেরা বলেন, এসব বিষয়ের উদাহরণ হলো নিদ্রিত ব্যক্তি। যেমন, স্বপ্নে সাপ-বিচ্ছুর দংশনে চিৎকার চেঁচামেচি করে ও ঘর্মাক্ত হয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী কেউ নিদ্রিত ব্যক্তির সর্পদংশন ও সর্পদংশনের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি আঁচ করতে পারে না। সুতরাং মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও হাশর-নশর সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হলে দৃষ্টির অগোচর ব্যাপার। তবে একটি কথা রয়ে যায়। স্বপ্নে সাপের দংশন-জ্বালা স্বপ্নমগ্নের জন্য যখন জাগ্রত সাপের দংশন-জ্বালার মতই কষ্টদায়ক, তখন এ দুই সাপের মধ্যে তারতম্য কোথায়?

তৃতীয় অবস্থাটা এই, সাপ স্বয়ং দুঃখ-কষ্ট নয়, দুঃখ-কষ্ট রয়েছে তার বিষে। বিষও দুঃখ-কষ্ট নয়, দুঃখ-কষ্ট তার প্রভাবজাত জ্বালায়। এখন যদি বাস্তব বিষ ছাড়া অন্য কিছু থেকে জ্বালা অনুভূত হয়, তাও তার থেকে আদৌ কম দুঃখদায়ক শাস্তি নয়।

সুতরাং প্রথমে আপনাদের ঈমান নবায়ন ও সংস্কার প্রয়োজন। নবায়নকৃত ঈমানের আলোয় আপনারা দেখতে পাবেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুখ-দুঃখ সবই বাস্তব।

তৃতীয় অধ্যায়

মালা-ই-আলা
(সর্বোচ্চ পরিষদ)

আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ পরিষদের মহামান্য ফেরেশতাগণের আলোচনা এনেছেন শাহ সাহেব (রহ:) এই অধ্যায়ে। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন, "যেসব ফেরেশতা (আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন করে চলেছে, যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। তারা তাঁর উপর ঈমান রাখে, তারা ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে। (তারা বলে), "হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছু বেষ্টন করে আছ, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার (দ্বীনের) পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাঁও।" (আল-কুরআন, ৪০:৭)।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা যখন আরশ থেকে কোন ফরমান জারী করেন, তখন ফেরেশতাদের পাখা ও পালক ঝড়াপেটা হতে থাকে। তাতে পাথরের উপর জিঞ্জীর আছড়ানোর মত শব্দ হয়। তারপর যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে ভয় ও অস্তিরতা দূর হয়, এখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ পাক কি নির্দেশ দিলেন? তখন কেউ একজন বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক সত্যটি প্রকাশ করেছেন এবং তিনিই সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠতম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: আল্লাহ পাক যখন কোন নির্দেশ দেন, তখন আরশবাহী ফেরেশতাগণ তাঁর তাসবিহ পাঠ করতে থাকেন। তারপর সেই তাসবিহ অনুসরণ করেন আশেপাশের পার্শ্বস্থ মজলিশ সদস্য ফেরেশতাগণ। এভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্নতর আকাশের, এমনকি দুনিয়ার ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাসবিহ পাঠের অনুসরণ করে চলেন। অবশেষে আরশের নিম্ন দিকের ফেরেশতাগণ আরশবাহী ফেরেশতাগণকে প্রশ্ন করেন, প্রভু তোমাদের কী নির্দেশ দিলেন ? তখন আরশবাহীগণ প্রভুর নির্দেশ বলে দেন এবং তা আবার শ্রুত হয়ে পর্যায়ক্রমে সপ্ত আকাশ পেরিয়ে দুনিয়ার ফেরেশতাগণের কাছে পৌঁছে যায়। অন্যত্র রাসূল (সা:) বলেন ,"আমি তাহাজ্জুদের জন্য জেগে উঠে ওজু সেরে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিলেন নামায পড়লাম। নামাযের ভেতরেই তন্দ্রা এলো এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন গভীর

ঘুমে নিমগ্ন হলাম, দেখতে পেলাম, আল্লাহ পাক অত্যন্ত পবিত্ররূপে জ্যোতির্ময় হয়েছেন। তিনি বলছেন; "হে মুহাম্মদ!" আমি জবাব দিলাম, "হে আমার পালনকর্তা! আমি উপস্থিত রয়েছি।"

তিনি প্রশ্ন করলেন, "সর্বোচ্চ পরিষদের ফেরেশতারা কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছে?"

আমি আরজ করলাম, "আমার তো জানা নেই।"

তিনি পরপর তিনবার একই প্রশ্ন করলেন এবং আমিও একই জবাব দিলাম।

অত:পর রাসূল (সা:) বললেন, "আমি দেখলাম, আল্লাহ আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন এবং আমি তাঁর আঙ্গুলের অগ্রভাগের শীতলতা অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম। তারপর সে কথাগুলো যে সম্পর্কে আল্লাহ প্রশ্ন করছিলেন আমার কাছে সুস্পষ্ট হলো। তাঁর (আল্লাহর) প্রশ্নের জবাবও আমার জানা হয়ে গেলো। অত:পর আল্লাহ পাক সম্ভোধন করলেন, "হে মুহাম্মদ! " আমি জবাব দিলাম, "হে আমার প্রভু! আমি হাজির আছি।"

তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, "হে মুহাম্মদ, উচ্চতম পরিষদ কোন বিষয়ে আলোচনা করছে?" আমি আরজ করলাম, "জামাতের জন্য পথ চলা, নামাযের পর (পরবর্তী নামাযের জন্য) মসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টের ভেতরেও পুরোপুরি ওজু করা।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "এ ছাড়া আর কি বিষয়ে আলোচনা করছে তারা?" আরজ করলাম, "মর্যাদার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে, আল্লাহ প্রশ্ন করলেন আবার, "সেগুলো কী?"

আরজ করলাম; "মিসকীন খাওয়ানো, সবিনয়ে কথা বলা এবং সবার ঘুমের সময় ইবাদাত করা (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া)।"

অন্যত্র রাসূল (সা:) বলেন, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তখন জিব্রাঈলকে ডেকে বলেন, "আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস।" সেমতে জিব্রাঈল তাকে ভালোবাসেন। তারপর নভোমন্ডলে ঘোষণা দেয়া হবে; "অমুক ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু, তাকে সবাই ভালোবাস।" তাই আকাশের সবাই তাকে ভালোবাসেন।

এভাবে পৃথিবীতেও তাকে জনপ্রিয় করা হয়। তেমনি আল্লাহ যখন কাউকে খারাপ জানেন, জিব্রাঈলকে ডেকে বলেন, অমুক ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করি, তুমিও ঘৃণা করতে থাক। তখন নভোমন্ডলে ঘোষণা দেয়া হয়, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করবে। অবশেষে সেই ঘৃণা পৃথিবীতেও দেখা দেবে।

উল্লেখ্য, শরীয়ত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহপাকের কিছু উত্তম বান্দা রয়েছেন। তাঁরা হলেন উচ্চ মর্যাদার আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা।

সেই ফেরেশতাগণ পৃথিবীব্যাপী উচ্চ পর্যায়ের পুণ্যবান বান্দাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন। ফলে তাদের উপর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। এইসব উচ্চ পর্যায়ের ফেরেশতা আল্লাহর নাফরমান ও ফেতনা সৃষ্টিকারী বান্দাদের উপর বদ-দোয়া ও অভিশাপ দিতে থাকেন। আর সে কারণেই নিম্নতর আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মনে তাদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য ইলহামেও জানানো হয়। ফলে পৃথিবীতে তারা দুর্ব্যবহার পায়; দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হবার (অর্থাৎ মৃত্যু) পরও পায়।

এই সকল উচ্চ পর্যায়ের ফেরেশতা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের ভেতর দূত হিসেবে কাজ করেন। তাঁরা বনি আদমের অন্তরে ভালো কথা ঢেলে দেন। তাঁরা যেকোন ভাবে অন্তরের ভালোভাবগুলো জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ পাক তাদের নিয়ে মজলিস বসান যেখানে চান সেখানে। তাদের এ মর্যাদা ও উচ্চাবস্থার জন্য আল্লাহ তাদের পৃথক পৃথক নামে ডাকেন। কখনো “রফিকুল আ'লা” (উচ্চস্তরের বন্ধু), কখনো ‘নুদীউল আ'লা’ (উর্ধ্বতম মজলিস সদস্য) ও কখনো মালা-ই-আলা (উচ্চতম পরিষদ) বলে আখ্যায়িত করেন। পূণ্যবান ও নৈকট্য লাভকারী লোকদের আত্মাও তাদের ভেতর শামিল হয়। আল্লাহ পাক বলেন, “হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে, অত:পর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও, (আর) প্রবেশ করো আমার (রচিত অনন্ত) জান্নাতে।” (আল-কুরআন, ৮৯:২৭-৩০)।

রাসূল (সা:) বলেন, “আমি জাফর ইবনে আবু তালিবকে ফেরেশতারূপে জান্নাতে অন্যান্য ফেরেশতার সাথে পাখায় ভর করে উড়তে দেখেছি।”

আল্লাহর সব বিধান ও সিদ্ধান্ত প্রথমে ‘মালা-ই-আ'লা’ য় অবতীর্ণ হয়। “দুনিয়ার যেসব কাজ তাৎপর্যময় ও কল্যাণধর্মী তা এই কদরের রাতে নির্ধারিত হয়”; আল্লাহর এ বাণী-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ উচ্চতম পরিষদে নির্ধারিত হয়। কোন না কোন ভাবে শরিয়ত এখানেই স্থিরিকৃত হয়। জানা প্রয়োজন, উচ্চতম পরিষদে তিন শ্রেণীর সদস্য রয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর দায়িত্বে রয়েছে আল্লাহর মঙ্গলময় ব্যবস্থাবলী। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ম হয়েছে মৌল উপাদানসমূহের সংঘাতে এবং তারা অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও পরম হালকা সৃষ্টি। তাদেরকে উঁচু পর্যায়ের আত্মার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে জীব জগতের পংকিলতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা হলেন, আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী মানবাত্মাগণ। তাঁরা

জীবিতাবস্থাতেই পূণ্যের কারণে ‘মালা-ই-আ’লা’র অনুরূপ মর্যাদা পান যা ‘মালা-ই-আলা’র সদস্যরা পেয়ে থাকেন। মৃত্যুর পর তাঁরা ‘মালা-ই-আলা’র সদস্যরূপে গণ্য হন।

‘মালা-ই-আলা’র আসল কাজ হল প্রতিনিয়ত নিজ প্রভুর দিকে নিবিষ্ট থাকা এবং অন্য কোন বাস্তবতাকে সেপথে অন্তরায় হতে না দেয়া।

যেসব পুণ্যাত্মা মৃত্যুর পর ‘মালা-ই-আলা’র সদস্য হন, ‘মালা-ই-আলা’র সবোচ্চ মর্যাদার ফেরেশতারা সেই পুণ্যাত্মার চারপাশে নূরের সমাবেশ ঘটান এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেন। তারপর এরা সবাই মিলে একাত্মতা লাভ করেন এবং নাম পান “হাদিরাতুল কুদুস” বা পবিত্র পার্লামেন্ট বা পবিত্র ও সর্বোচ্চ আইন সভা”।

এ পবিত্র আইনসভা বনি আদমের পার্থিব ও অপার্থিব কার্যাবলির ব্যবস্থাপনার জন্য এবং তাদের সমস্যা দূর করার জন্য পরামর্শ করে কোন ব্যক্তিকে পূণ্যত্ব দেয়ার ব্যাপারে ফয়সালা করে। সে ব্যক্তিটি হবেন সেই যুগের উত্তম ব্যক্তি। এ পরামর্শ অনুসারেই যোগ্য লোকদের অন্তরে ইলহাম অবতীর্ণ হয় যে, সেই ব্যক্তির অনুগত হয়ে তারা এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যারা গোটা মানবজাতির সেবা করবে। জাতির সংশোধন ও পথপ্রদর্শন এভাবেই হয়।

উপর্যুক্ত ইলহাম কখনো ওহীরূপে আসে, কখনো কেউ স্বপ্নে দেখতে পায়, কখনো গায়েবী আওয়াজ হয়, কখনো হাদিরাতুল কুদুসের প্রতিনিধি সেই ব্যক্তির (নবীর) সাথে দেখা করে সরাসরি খবর পোঁছে দেন। এ কারণেই সেই ব্যক্তির সহচর ও অনুচররা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে তাঁর সাফল্য ও মঙ্গলের উপকরণ ও সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাঁর দুশমন ও আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারীদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। ফলে তারা ব্যর্থতা ও দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। নবুয়তের অন্যান্য মূলনীতির মধ্যে এই মূল নীতিটি অন্যতম।

এই সকল ফেরেশতাদের এরূপ স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সিদ্ধান্তকে বলা হয় “তাঈদে রূহুল কুদুস” বা পবিত্র আইনসভার সহায়তা। এটা যারা লাভ করেন তারা অলৌকিকতার অধিকারী হন। এভাবেই প্রকাশ পায় - মুজিযা।

এই দুই শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের ‘মালা-ই-আলা’র এক স্তর নীচে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন। এরা সরল, নাজুক ও সুক্ষ্ম প্রকৃতি বিশিষ্ট। এ সরল প্রকৃতির সৃষ্টিরা কেবল প্রেরণা ও নির্দেশনা লাভের অপেক্ষায় থাকেন। তাঁর প্রভাব ও আল্লাহর দেয়া প্রভাব গ্রহণের ক্ষমতার ভেতর যখন সমতা স্থাপিত হয়, তখন তারা নিজ অস্তিত্ব ভুলে মাল-জান বাজি রেখে নির্দেশিত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পশু-পাখী যেমন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ছুটে যায়, তার স্রষ্টার ইংগিতে।

নিকট অতীতে এদের উদাহরণ হলেন- সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ), শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ)।

এ ফেরেশতাদের বিপরীত দিকে রয়েছে উত্তপ্ত আধার থেকে সৃষ্ট সৃষ্টি। এরা হলো শয়তান। এ শয়তানরাই ফেরেশতাদের প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্য পাল্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর অবিচল বিধান

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আগে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের জন্য এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ম (যে, বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড), আল্লাহ তায়ালার এ নিয়মে তুমি কখনো কোন ব্যতিক্রম দেখবে না।” (সূরা আহযাব; ৬২)। সূরা রুমে আল্লাহ বলেন, “অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের উপর কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির উপর (নিজেকে দাঁড় করাও) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; (মনে রেখো) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোন রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।” (সূরা রূম, ৩০)।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কিছু কাজ তাঁর প্রবর্তিত প্রাকৃতিক শক্তির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। উদ্বৃতি ও যুক্তিবুদ্ধি উভয়ই এ কথার সমর্থন দেয়। রাসুল (সা:) বলেন “আল্লাহ পাক গোটা দুনিয়ার এক মুষ্টি মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আদম সন্তান কেউ লাল, কেউ কালো কিংবা দুয়ের মাঝামাঝি বর্ণের এবং নম্র বা রুক্ষ ও ভালো-মন্দ প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রকৃতির এ শক্তির কারণেই মানুষকে শরিয়তের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে মানুষকে পুরষ্কার ও তিরষ্কারের যোগ্য করা হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক শক্তি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যে শক্তি জড় বস্তুর গুণাগুণ সৃষ্টি করে। দুই, রূপান্তর ও শ্রেণীভেদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যে শক্তিকে সক্রিয় রেখেছেন। এই দ্বিতীয় শক্তিটি সম্পর্কে আমি কিছু ব্যাখ্যা পেশ করবো। এই দ্বিতীয় শক্তি যার রয়েছে রূপান্তরের ক্ষমতা তা মূলত: ক্রিয়াশীল জড় বস্তুতে। তাও জড় বস্তুর সবকিছুতে নয়। বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মৌলিক কণা, যেমন, অনু, পরমানু লেভেলে এই রূপান্তর শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। কোন ভৌত বড় বস্তু সাধারণত: রূপান্তরের শিকার হয় না। কারণ, তার জন্য এমন শক্তি প্রয়োজন যা ভৌত রূপান্তর ঘটাবে যা সাধারণত: কোন বল বা শক্তির উপস্থিতির মাধ্যমে হয়। কিন্তু বড় জড় বস্তুর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া বলতে গেলে নেই। ফলে কোন শক্তিও ক্রিয়াশীল হতে পারে না বড় জড় বস্তুর রূপান্তর ঘটাবার জন্য।

কিন্তু ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অনু-পরমানু লেভেলে মিথষ্ক্রিয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার যা অহরহ ঘটছে। ফলে সেখানে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা বল উপস্থিত আছে। তাই বর্তমান

কালের বিজ্ঞানীরা রাসায়ণিক বস্তুর মাঝে বিবর্তনের মত কিছু প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। সেখানে ডারউইনের বিবর্তন নীতির চার শক্তির প্রায় প্রত্যেকটি কিছু না কিছু পরিমাণে উপস্থিত আছে এবং সেই উপস্থিত বিবর্তনবাদী শক্তি রাসায়ণিক বস্তুর বিবর্তন ঘটায়। প্রাকৃতিক শক্তির তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, যে শক্তি জড় জগতের আত্মপ্রকাশ ঘটায়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। শাহ সাহেব (রহ:) ব্যবহার করেছেন "ছায়া জগত" শব্দ। আমি বলি তা মূলত: অদৃশ্য ও সম্ভাবনার জগত। সকল সৃষ্টি দৃশ্য ও অদৃশ্যের মাঝে দোলায়মান থাকে। কখনো দৃশ্য, কখনো অদৃশ্য। বড় জড় বস্তুর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরমানু বা কণাদের ক্ষেত্রে এই দৃশ্য ও অদৃশ্যের মাঝে থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে এমনকি গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এরিস্টটল অনেক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "বস্তু জগতে এক হলো অবয়ব আর অন্য একটি হলো সম্ভাবনা।"

যা দৃষ্টিগোচর হয় দৃশ্যমান জগতে তা সৃষ্টি হয় অদৃশ্য জগতে বা সম্ভাবনার জগতে। সম্ভাবনা না থাকলে কোন কিছুই আত্মপ্রকাশ করে না। তাই কণা, অনু, পরমানু থাকে দুটি বিশ্বের মাঝে। এক হলো দৃশ্যমান জগত, অন্যটি হলো অদৃশ্য বা সম্ভাবনার জগত। আল্লাহ পাক প্রথমে সব কিছুকে সম্ভাবনার জগতে সৃষ্টি করেন। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় যখন ঢেউ উঠে, আল্লাহ বলেন, 'হও'। অমনি বস্তুটি দৃশ্যমান জগতে আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং বলা যায়, অদৃশ্যই দ্রশ্যমানের সৃষ্টিস্থল ও আবাসস্থল। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বস্তুরা দৃশ্যমান জগতে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাকৃতিক শক্তির চতুর্থটি হলো, "পরিমার্জিত ও পুণ্য চরিত্রের মানুষের জন্য উচ্চতম পরিষদের দোয়া ও তাদের শত্রুদের জন্য মনে প্রাণে বদ দোয়া থেকে যে শক্তির দেখা মিলে"।

পাঁচ নম্বর শক্তি হলো, আল্লাহর বিধি নিষেধ তথা শরিয়তের শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে পুণ্যের অনুসারীরা সাফল্য লাভ করে ও পুণ্য উপেক্ষাকারীরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়। প্রাকৃতিক শক্তির ছয় নম্বরটি হলো, যে শক্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ পাক কোন কিছু সৃষ্টি হবার নির্দেশ জারী করলে আগে এর কারণটি সৃষ্টি হয়। এই কারণটি সৃষ্টির কাজ আঞ্জাম দেয়। আল্লাহ চান সৃষ্টি জগত কার্যকারণ শৃংখলে আবদ্ধ থাকুক। অন্যথায় বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি জগত ধ্বংস করে দেবে। নবী করীম (সা:) বলেন, আল্লাহ যদি চান অমুক ব্যক্তির অমুক স্থানে মৃত্যু হোক, তখন তার সেখানে পৌঁছে যাবার কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়।

অপরদিকে নবী করীম (সা:) এর শরিয়ত এ কথা কোথাও বলেনি যে, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির উপর আল্লাহ এমন কোন শক্তি রাখেন নি যা প্রকৃতির বিবর্তন লীলায় অংশ রাখে না। তবে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে কারো ভালোমন্দ বলে দেয় যেসব জ্যোতিষী- রাসূলে পাক (সা:) সেসব জ্যোতিষীর মত হতে নিষেধ করেছেন। মোট কথা, জ্যোতিষ শাস্ত্র নিষিদ্ধ করার ভেতর অজস্র কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণের রহস্য

আল্লাহ বলেন, “(হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায় রূহ কি (জিনিস), তুমি (এদের) বলো, রূহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, (আসলে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্তই অল্প।” (সূরা বনী ইসরাইল, ৮৫)। অত্র আয়াতের প্রশ্নকারীরা ইহুদি ছিল। কিন্তু তাতে এ কথার প্রমাণ মিলে না যে, মুসলমানগণ প্রাণের রহস্য মোটেও জানতেন না। মহানবী (সা:) এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন বলেই যে, উম্মতের আলেমগণ রূহ সর্ম্পকে জানবে না তা কিন্তু নয়। নবী করীম (সা:) বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন নি এজন্যেই যে, এসব সুক্ষ্ণ ও জটিল বিষয় দু'চারজনে বুঝলেও সর্ব সাধারণের বোধগম্য হবে না। আসলে প্রাণীজগতের আয়ুষ্কালের ভিত্তি ও উৎসই হলো প্রাণ। প্রাণ যতক্ষণ দেহে আছে-ততক্ষণই প্রাণী জীবিত থাকে। যখন প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যায়, প্রাণীটি মৃত্যু বরণ করে। গভীর চিন্তার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, প্রাণ হলো সংমিশ্রণমুক্ত একক ও স্বতন্ত্র এক জিনিস। তা হল এমন এক নূর বিন্দু বা আলোক পিন্ড যা পরিবর্তন স্বীকার করে না। প্রাণসত্তা ছোট ও বড়, কালো ও সাদা ও অন্যান্য বিপরীত ধর্মী বিভিন্ন অবস্থার প্রাণীতে একই রকম থাকে।

এবারে আমি শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব গবেষণার কিছু নির্যাস বলবো। তা হলো প্রাণের তিনটি উৎস, যেগুলো জড় উৎস, থাকে। (১) দেহ, (২) নাফস বা মস্তিষ্ক বা মন ও (৩) হৃদপিন্ড। এগুলো যখন কর্মচঞ্চল থাকে প্রাণীটি জীবিত থাকে। এগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি যন্ত্র যারা ভৌত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট। এখন মানুষের মধ্যে কেউ দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান, কেউ মস্তিষ্কের শক্তিতে এগিয়ে বা কেউ শক্তিশালী হার্ট নিয়ে জীবনযাপন করে। এই যে শক্তিগুলো-এগুলো ভৌত শক্তি। এগুলোতে কখনো জোয়ার আসে কখনো ভাটা আসে। তাই কেউ অকর্মন্য হয়ে যায়, কেউ চিন্তা করতে পারে না, কেউ হৃদপিন্ডের শক্তি হারিয়ে ফেলে। এমন ব্যক্তির মত অবস্থা নিয়েও অন্য কেউ শক্তিশালী দেহ, মস্তিষ্ক ও হৃদপিন্ড নিয়ে থাকতে পারে। এই যে অতিরিক্ত শক্তি তা কোত্থেকে আসে? অতিরিক্ত শক্তি আসে সম্ভাবনার জগত বা অদৃশ্য জগত থেকে। আসলে- প্রত্যেকটি ভৌত যন্ত্রের সমান্তরালে একটি আত্মিক বা রুহানী শক্তির উৎস থাকে। যেমন, যাকে আমরা সাধরণভাবে রুহ বলি সেটি দৈহিক শক্তির সমান্তরালে অবস্থিত আত্মিক শক্তি। তেমনিভাবে,

মস্তিষ্কের সমান্তরালে সম্ভাবনার জগত থেকে আসে এক শক্তি সেই শক্তির উৎসকে বলে ‘সির্’। সর্বশেষে রইল, হৃদপিন্ড বা ক্বালব। ক্বালবের দুর্বলতায় শক্তি যোগায় অদৃশ্য সম্ভাবনার জগতের এক উৎস যাকে বলা হয় ‘আখফা’।

তাই প্রাণের মোট ছয়টি উৎস। তিনটি ভৌতঃ দেহ, মস্তিষ্ক ও ক্বালব। তিনটি রুহানীঃ রুহ, সির্ ও আখফা। এই ছয় শক্তির ভারসাম্য যতবেশি অর্জিত হবে মানুষটি ততোই শক্তিশালী হবে। পার্থিব ব্যাপারেও, পারলৌকিক ব্যাপারেও। পার্থিব শক্তিমত্তা ভৌত বা যন্ত্রনির্ভর। পারলৌকিক শক্তিমত্তা রুহানী বা অদৃশ্যের শক্তি। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ছয়টি শক্তির উৎসই প্রাণের উৎস। আর এই হলো সুফীগণের গবেষণার গবেষণালব্দ প্রাণ সম্পর্কিত জ্ঞান।

ষষ্ট অধ্যায়

দায়িত্ব তত্ত্ব

আল্লাহ পাক বলেন, "অবশ্যই আমি (কুরআনের এ) আমানত (এক সময়) আসমান সমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা এঁকে বহন বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।" (সূরা আহযাব, ৭২)। এখানে আমানত হলো আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আকাশ ও পৃথিবীর অন্য সবাই সভয়ে এ দায়িত্ব পরিহার করেছে। মানুষ এ দায়িত্ব কাঁধে নেবার কারণে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যেমন পুরষ্কার পাবে, তেমনি তার অবাধ্যতার জন্য শাস্তিও পাবে।

জালিম হলো সে যে ইনসাফ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জুলুম করে। জাহিল হলো সে- যার জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মুর্খ থাকে। বস্তুত মানুষ ছাড়া সব সৃষ্টি হয় শুধু আলিম ও আদিল। নয় তারা শুধুই জালিম ও জাহিল। প্রথমোক্ত দল হলো, ফেরেশতাগণ। শেষোক্তরা- চতুস্পদ প্রাণী। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত আমানত বহন করতে সক্ষম কেবল তারাই যারা প্রকৃতিগতভাবে নয় বরং উপার্জনের মাধ্যমে আলিম ও আদিল বনে যায়। আর তখন দায়িত্ব গ্রহণের পরিণতি হলো সুখ ও দুঃখ।

ফেরেশতাগণ সকল প্রকার প্রয়োজনের উর্ধ্বে থেকে আল্লাহর শাহী ফরমান পালনে সর্বদা প্রস্তুত। চতুস্পদ জন্তুরা জৈবিক চাহিদা ছাড়া অন্য কোন কিছুই বুঝে না। তাদের শুধু জৈবিক আনন্দ চাই। আর আল্লাহ পাক তাঁর পরিপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করে মানুষের ভেতর পরস্পর বিরোধী দুটো শক্তিরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এক) ফেরেশতা প্রকৃতি (বিবেক)। মৌলিক প্রাণের প্রেরণা গ্রহণই ফেরেশতা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তার উপরই মৌলিক প্রেরণা প্রাধান্য বিস্তার করে।

দুই, পশু প্রকৃতি (প্রবৃত্তি)। অন্যসব পশুর ভেতর যে জৈব প্রবৃত্তি রয়েছে সেটাই মানুষের ভেতর পশু প্রকৃতির ভিত্তি ও উৎস। পশু প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। মৌলিক প্রাণও তার নির্দেশ মেনে নেয়। বিবেক ও প্রবৃত্তি সর্বদা সংঘাতে লিপ্ত থাকে। যদি কেউ পশু স্বভাবের প্রাধান্য দিতে চায়, আল্লাহ তার পথ খুলে দেন। কেউ যদি ফেরেশতা প্রকৃতির প্রাধান্য

রাখতে চায়, আল্লাহ পাকও তাকে তার ব্যবস্থা করে দেন। প্রত্যেক প্রকৃতিতেই সুখ ও দুঃখ রয়েছে। নিজ প্রকৃতির অনুকূল ব্যাপারের অনুভূতি হলো সুখের উৎস। প্রতিকূল ব্যাপার উপভোগ করার নাম দুঃখ। এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের যোগ্যতাই দায়িত্ব দাবী করে। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও জবাবদিহীতা সেই দাবীর অনুকূল। আর মানুষের ভেতরকার বিবেক এই দাবী জানায় যে, তার অনুকূল ও উপযোগী কাজগুলো তার জন্য অপরিহার্য তথা ফরজ করা হোক।আর প্রতিকূল ও অনুপযোগী পশু প্রকৃতির কাজগুলো নিষিদ্ধ তথা হারাম করা হোক। তা হলেই সে শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সপ্তম অধ্যায়

দায়িত্ব মানুষের বিধিলিপি

আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর বিধি নিষেধ চাপিয়ে প্রত্যেক বিধি নিষেধে কল্যাণ রেখেছেন। জগতে বহু প্রজাতির প্রাণী আছে। এসব প্রজাতির শ্রেণীরূপ বা শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জীব একই ধরণের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

পশুদের দিকে তাকান। তাদের ভেতর এমন কতগুলো স্বতঃস্ফুর্ত ও প্রকৃতিগত বিষয় দেখা যায় যা থেকে সহজেই এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীর পার্থক্য করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর ভেতর কেবল ততটুকু স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান রয়েছে যতটুকু তার একান্ত প্রয়োজন ও তার জন্য কল্যাণকর। এসব হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান।

কোন শ্রেণীতে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যগুলো সবার ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু কোন শ্রেণীতে কিছু সংখ্যকের ভেতর পাওয়া যায় ও কিছু সংখ্যকের ভেতর পাওয়া যায় না। এর মূলে রয়েছে উপাদানের উপযোগিতা কিংবা দুর্বলতা।

মানুষ উপরোক্ত আলোচনার বাইরে নয়। মানুষ জন্ম নেয়, বৃদ্ধি পায়, কাশী দেয়, হাই তোলে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারে, জন্ম নিয়ে মাতৃস্তন্য পান করে, ইত্যাদি। এতদসঙ্গে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষ ধারণ করে যেগুলো অন্য জাতীয় সৃষ্টি থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র মহিমায় উন্নীত করেছে। যেমন, কথা বলা ও বুঝা, ভূমিকা বুঝেই বিষয়জ্ঞান অর্জন করা, সাধনা ও গবেষণা চালিয়ে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা, বস্তুকে উন্নত জ্ঞানের সাহায্যে পরিপূর্ণভাবে জানা। মানুষের যেহেতু গতি, অনুভূতি, জৈব তাড়না, ও বুদ্ধি-বিবেকের প্রেরণা রয়েছে এমনকি অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতাও মানুষের রয়েছে, তাই তাকে চাষাবাদ করা, বৃক্ষরোপন, লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজাত জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কিছু লোককে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সুলভ ও কিছু লোককে দাসত্ব- আনুগত্য সুলভ স্বভাব দেয়া হয়েছে। এক দলকে রাজকীয় ও অন্য দলকে প্রজা সুলভ স্বভাবের অধিকারী করা হয়েছে। কাউকে আল্লাহতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শাস্ত্রের গভীর ও জটিল জ্ঞান দেয়া হয়েছে। শহুরে হোক কিংবা গেঁয়ো, সবার ভেতরেই স্বভাব ও ক্ষমতার এ বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

যা কিছু আলোচিত হলো তা মানুষের জৈবিক জীবন ও জীবসুলভ শক্তি সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু মানুষের ফেরেশতাসুলভ স্বভাবও রয়েছে। মানুষকে তাই সৃষ্টির সেরা বানানো হয়েছে। তার জ্ঞান তাকে জানায় যে, সৃষ্টির এ বিশাল প্রাসাদের একজন মহান পরিচালক রয়েছেন। তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন ও রুজী সরবরাহ করে চলেছেন। তাই তারা সবাই মিলে অন্তত হাবভাবে সেই মহান পালনকর্তার ও বিজ্ঞতম স্রষ্টার কাছে বিনয়বনত থাকছে। তাই আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতেঃ “(হে মুহাম্মদ!) তুমি কি দেখছ না নভোমন্ডলের বাসিন্দারা, পৃথিবীর অধিবাসী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, গাছপালা, চতুস্পদ জন্তু এবং বহু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর সমীপে বিনয়াবনত রয়েছে? তবে বহু লোক এমনও রয়েছে যাদের ভাগ্যে (নাফরমানীর কারণে) রয়েছে নির্ধারিত শাস্তি।” (সূরা হজ্জ; ১৮)।

কিছু মানুষ অদৃশ্য জগতের কথায় পুর্ণত্ব প্রাপ্ত হন এবং কিছু লোক অপূর্ণ থাকেন। অপূর্ণদের তাই পূর্ণতা প্রাপ্তদের শরনাপন্ন হতে হয়। তদুপরি মানুষের রয়েছে এমন কিছু, যেমন বিনয়, পবিত্রতা, ন্যায় পরায়নতা, দানশীলতা, উদারতা প্রার্থনালব্ধ ঐশী প্রভাব, গুণ যা অন্যান্য জীবের নেই। মানুষের গুণাবলীতে আরও রয়েছে- কারামত।

সুতরাং যে সব বৈশিষ্ট্য মানুষকে জীবজগতে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে তার সংখ্যা অনেক। তবে সবগুলোই মূলে দুটি শক্তির কোন না কোনটি। (১) জ্ঞান বা বোধশক্তি, এর রয়েছে দুটো শাখা। একটি শাখার ঝোঁক থাকে মানবিক কল্যাণ ও তার সুক্ষাতিসুক্ষ দিকে। অন্যটির ঝোঁক থাকে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি সবকিছু জানার দিকে। (২) পূর্ণাঙ্গ কর্মশক্তি। এরও দুটো শাখা রয়েছে। একটির সাহায্যে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ভাল বা মন্দ কাজ করে। পক্ষান্তরে, জীবজন্তুর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন বালাই নেই। ভাল বা মন্দ কাজের ভাবনাও তাদের মধ্যে নেই। ভাল বা মন্দ কাজ দ্বারা তারা প্রভাবিতও হয় না।

শরীয়ত মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কাজ করার ক্ষেত্রেই কেবল জবাবদিহি করার শৃংখলে বেধেঁছে। তেমনি মানুষ সর্বসম্মতভাবেই পাপাচার ও নাফরমানিকে খারাপ বলে জানে। জীবজগতে মানবের স্বতন্ত্র সৃষ্টির দ্বিতীয় শক্তিটির দ্বিতীয় শাখা হলো তার উন্নততর অবস্থা ও শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা। এ অবস্থা ও মর্যাদা অন্যান্য জীবের নেই। যেমন, আল্লাহ প্রাপ্তি ও আল্লাহ নির্ভরতা।

পরিমিত স্বভাব মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। এটি নিম্নোক্ত জিনিসগুলো ছাড়া পূর্ণতা পায় না। (১) উন্নততর ও উত্তম ব্যক্তির অর্জিত উত্তম জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ। (২) আল্লাহর বিধি বিধান বা শরীয়ত অনুসরণ। (৩) নীতিশাস্ত্র। এ শাস্ত্রে রয়েছে সেই জ্ঞান যা দেয় কোনটি ফরজ, কোনটি হারাম, কোনটি মুস্তাহাব, কোনটি মুবাহ ও কোনটি মাকরুহ। (৪) মানবতার ও মানবিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর উপায়-উপকরণ।

আল্লাহ পাক ব্যক্তি বিশেষকে অদৃশ্য জগতের উন্নততর জ্ঞান দান করেন। এসব ব্যক্তির প্রতি অন্যরা আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর কাছ থেকে উপরোক্ত জ্ঞান অর্জন করে নেয়। ঠিক সেভাবেই আল্লাহ পাকের কলা-কৌশল নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই এমন কতক বিদ্যা কোথাও দান করে রেখেছেন তার সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞানগত দুর্বলতা দূর করে পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে। এসব জ্ঞানের অন্যতম হলো স্রষ্টার একত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান। এই বিদ্যার বিশ্লেষণ আল্লাহ পাক তার পরিচিতির মাধ্যমে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী (আল্লাহ নিজ গুণাবলি নিয়ে সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র বা মুক্ত রয়েছেন)"। তাঁর প্রত্যেকটি গুণই আমাদের থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। আর এ ক্ষেত্রেই আল্লাহর রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব ও অতুলনীয়তা। তিনিই ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম কলা-কৌশল প্রয়োগ করে এবং ফেরেশতারা অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের মধ্যে থাকা কিছু জ্ঞানের কিছুটা ঝলক পেয়েছেন। আল্লাহ এদের ব্যাপারেই বলেন, "আরশবাহী ও তাদের পার্শ্বচরবা" ইত্যাদি। যখন শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় ও জাতীয় পরিবর্তনের মুহূর্ত আসে তখন আল্লাহ কিছু আত্মিক জিনিসের আবির্ভাব ঘটান। সে সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, "আমি এ (কুরআন রূপ) জ্ঞান ভান্ডারকে এক কল্যাণময় রাতে (শবে কদর) অবতীর্ণ করেছি। আমি সতর্ককারী ছিলাম। এ রাতেই সব হিকমতপূর্ণ ব্যাপার আমার দরবার থেকে নির্দেশ (অর্ডিন্যান্স) আকারে মিমাংসীত ও বন্টিত হয়।" (সূরা দুখান, ৩-৪)। অত:পর আল্লাহর কৌশলগত প্রয়োজনে এক পূণ্য ও পূত:পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তিকে নবুয়ত দেয়া হয়েছে। তাকে ওহী ধারনের যোগ্যতাও দান করা হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে মানুষের উপর আল্লাহর তরফ থেকে দলীল- প্রমাণ সুদৃঢ় ও বিজয়ী করা হয়েছে।

অত:পর কেউ যদি ফরজ কোত্থেকে এলা, রাসুলের আনুগত্য কি করে ওয়াজিব হলো- এসব প্রশ্ন করে তবে তার জবাব হলো-যেখান থেকে গরু-ছাগলের মাংস খাওয়া হারাম ও তৃণলতা খাওয়া ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে, সেখান থেকেই মানুষের ফরজ-ওয়াজিব নির্ধারিত হয়েছে। হ্যাঁ, তফাত এই যে, পশু পাখীর ফরজ-হারাম ইত্যাদি আসে প্রকৃতিগত ইলহামের দ্বারা। আর মানুষের ক্ষেত্রে মানুষ সাধনালব্ধ ওহীর ও দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে ফরজ- হারামের সন্ধান পায়। তারপর অন্যান্যরা পায় ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে।

অষ্টম অধ্যায়

দায়িত্ব ও প্রতিদান

মানুষের জন্য রয়েছে যেমন কর্ম তেমন ফল। এক্ষেত্রে চারটি অবস্থা দেখা দেয়।

(১) জাতিগত স্বভাবের চাহিদা। যেমন- গরু-ছাগল ঘাস খাবে, ফলে তাদের স্বভাব ঠিক থাকবে। মানুষ এমন কাজ করবে যাতে আল্লাহর কাছে বিনয়, পবিত্রতা, মনের সারল্য ও খোদাভীরুতা এবং বিবেকের ইনসাফ প্রকাশ পায়। তাহলে সেগুলো তার ফেরেশতা স্বভাবের পরিপোষক হবে। তবে যদি এর বিপরীত কাজ করে মানুষ, তখন তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) মালা-ই-আলার প্রভাব। মালা-ই-আলার ফেরেশতাদের খুশী-অখুশী দ্বারাও মানুষ প্রভাবিত হয়। এ প্রভাব দেখা দেয় স্বরূপ জগতের আদি মানব সত্তার উপর। সেই সত্তার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন ফেরেশতাগণ। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ফেরেশতাদের সৃষ্টি। দেহ বিশিষ্ট মানব যেমন অনুভূতি ও উপলব্দি শক্তি ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি স্বরূপ জগতের দেহহীন ছায়া মানব ফেরেশতাদের ছাড়া চলতে পারে না। যখন কেউ একটি ভালো কাজ করে, তখন সেবক ফেরেশতারা খুশী হন এবং সে কাজ থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। যদি কেউ খারাপ কাজ করে, তখন সেবক ফেরেশতারা অসন্তুষ্ট হন এবং সেই কাজ থেকে অন্ধকার এক ধোয়ার কুন্ডলী নির্গত হয়। এ দুটোই সেই মানবসত্তাকে প্রভাবিত করে এবং মানুষটি সুখ কিংবা দুঃখ অনুভব করে।

এই দুই ধরনের প্রয়োজন মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতির চাহিদা মাত্র। আর যে প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা চির অপরিবর্তনীয়।

(৩) মানুষের উপর যা অপরিহার্য করা হয়েছে তা শরিয়তের দাবী। ফলে কোন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি জানতে পারেন কোন রাত লায়লাতুল কদর যে রাতে সমস্ত হিকমত পূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও সেগুলো বিলি বন্টন করা হয়। তখনও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আত্মীক জগতে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই সময়ের চাহিদা মোতাবেক সেই যুগের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ইলহাম বা ওহী অবতীর্ণ হয়। তার মাধ্যমে সেসব ইলহাম তার সমমেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। তারপর অন্যান্য সাধারণ লোকের কাছে এ ইলহাম পৌঁছানো হয় যারা অবতীর্ণ ইলহাম মেনে চলে। অত:পর সেসব

ইলহামের সমর্থক ও সহায়কদের সাহায্য করা হয়। আর ইলহাম বিরোধীদের লাঞ্ছিত ও পরাভূত করা হয়। এই প্রতিদান দাবী শরিয়তের পরিপোষক ও যুগে পরিবর্তনের সাথে এর পরিবর্তন হয়। এ জন্যেই যুগে

যুগে ভিন্ন ভিন্ন নবী পাঠাতে হয়েছে। নবী করীম (সা:) বলেন, "আমাকে যারা মানল ও আমার বিধানকে সত্য জানল, তাঁরা বেঁচে গেল এবং যারা আমাকে মিথ্য জানল ও অমান্য করল, তারা ধ্বংস হল।"

(৪) নবীর আনুগত্য। আল্লাহ মানুষকে নবীদের আনুগত্য করা অপরিহার্য করেছেন। নবীর কাছে যেসব ওহী আসে সেগুলো নির্দিষ্ট বিদ্যায় রূপ লাভ করে। নবী ও আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সেসব বিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিদান প্রকৃতিটি এমন যে, এর চাহিদা নবী প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত দেখা দেয় না। যারা জেনে শুনে বাচঁতে কিংবা ধ্বংস হতে চায় তাদের বেলায় এ প্রতিদান প্রকৃতিটি ধরা দেয়। তখন আর এ প্রয়োজন অস্বীকার করার তাদরে কোন অজুহাত অবশিষ্ট থাকে না।

নবম অধ্যায়

কর্ম প্রেরণার উৎস

মানুষের যেসব মনোজগত ও মস্তিষ্ক প্রসূত ভাব তাদের বিভিন্ন কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়, সেগুলোর উদয়ের পেছঁনে কোন না কোন কারণ থাকে। কারণ, সব কিছুই সৃষ্টি হবার ব্যাপারে আল্লাহর কার্য-কারণ রীতি সক্রিয়। এ কথা সহজেই বোধগম্য যে, সত্যিই সেসব মনোজাগতিক ভাবের পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকে। সেসব কারণের সেরা কারণ হলো আল্লাহ প্রদত্ত মানব প্রকৃতি। খানা-পিনার মত বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে সেসব মনোজাগতিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই আমরা দেখি, ক্ষুধার্ত খেতে চায়, তৃষ্ণার্ত পানি চায়, কামাতুর নারীসঙ্গ চায়; ইত্যাদি। কখনো মানুষ এমন বস্তু খায় যা তার কাম প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে নারী ঘেষা হয়ে যায়। কেউবা কখনো এমনিভাবে রূঢ়তা সৃষ্টি করে। ফলে সে মানুষকে হত্যা করার মত কঠিন ও অপরাধমূলক কাজ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। এ দু' ধরণের মানুষ যখন নামায -রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালায় কিংবা বেশ বৃদ্ধ হয়ে যায়, অথবা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তখন তার আগের অবস্থা অনেকটা বদলে যায়। তার অন্তর নম্র ও প্রকৃতি সরল হয়ে যায়।

মোট কথা, কারো কোন কিছুর অভ্যাস হবার বা কিছু ভালো লাগার পেছনে কারণ হলো, সে সেটা বেশি বেশি করার ফলে মনের পাতায় চিত্রিত হয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ সময়ই সেটার ভাবনা তাকে পেয়ে বসে।

কখনো মানবিক প্রকৃতি পশু প্রকৃতির হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চ পরিষদ থেকে সাধ্যানুসারে দ্যুতিময় হয়ে যায়। তার ফলে ভালো কাজের প্রেরণা ও প্রীতি এবং মানসিক শান্তি ও স্বস্তি দেখা দেয়। ফলে কখনো কোন উন্নত মানের ভালো কাজ করার দৃঢ় সংকল্প দেখা দেয়। কখনো জৈবিক প্রবৃত্তি শয়তানের সাহচর্যে পড়ে তারই রঙ্গে রঞ্জিত হয়। তখন তা থেকে মানুষের খারাপ কাজগুলো দেখা দেয়।

খেয়াল করুন, স্বপ্নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন-মগজের খেয়াল থেকে সৃষ্টি হয়। শুভ স্বপ্নের জন্য মন পরিষ্কার ও নির্ভেজাল হওয়া চাই। তা হলেই তাতে স্বপ্নের সুন্দর কথাগুলো চিত্রিত ও রূপায়িত হতে পারে। আল্লামা ইবনে সিরীন বলেন, স্বপ্ন তিন ধরণের (১) অন্তরের স্বগতোক্তি, (২) শয়তান ভীতি ও (৩) আল্লাহর সুসংবাদ।

দশম অধ্যায়

যার কাজ তা তার সাথেই থাকে সংখ্যাও সুরক্ষিত হয়

আল্লাহ পাক বলেন, "আমি প্রত্যেক মানুষের কাজ তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। কেয়ামতের দিন সেগুলো গ্রন্থাকারে তাদের সামনে তুলে ধরব। তারপর বলব, পড়ে নাও তোমার কাজের ফিরিস্তি। এটাই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।" (সূরা বনি ইসরাইল: ১৩-১৪)।

নবী করীম (সা:) আল্লাহ পাক থেকে বর্ণনা করেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বলবেন, এই হলো তোমাদের আমলনামা। আমি এটাঁ সযত্নে সুরক্ষিত রেখেছি।" এরই বিনিময় তুমি পাবে। তাই সুফল যে পাবে, আল্লাহর নিকট তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কুফল যে পাবে, তার নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।"

তিনি (সা:) আরও বলেন, প্রবৃত্তিতে কামনা-বাসনা জাগে। অঙ্গপ্রতঙ্গ হয় তা বাস্তবায়িত করে, নয় তা নাকচ করে দেয়। মানুষ স্বেচ্ছায় যে কাজগুলো করে সেগুলো এবং তার ভেতর দানা বেঁধে থাকা অভ্যাস ও চরিত্র, তার সব কিছুর উৎসক্ষেত্র মানবিক প্রাণ থেকে নির্গত হয়ে সেখানেই আবার ফিরে এসে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন উঠে, প্রাণ থেকে সেগুলোর সৃষ্টি হয় কীভাবে? জবাব এই, মানব দেহের অভ্যন্তরে ফেরেশতা প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতির এবং এ দুয়ের সংঘাত ও সংমিশ্রণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রকৃতির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা, ফেরেশতা ও পশু প্রকৃতির প্রভাব এবং এ ধরণের যে সব কারণ মানুষের কাজের প্রেরণা যোগায়, সবগুলোই মানব প্রকৃতি থেকে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখানেই নিহিত থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, মানুষের মূল প্রাণই সবকিছুর উৎস। সেটি থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্য সব নতুন ক্রিয়াকর্মের জন্ম।

এখন প্রশ্ন জাগে, কাজগুলো নির্গত হয়ে মূল প্রাণে আবার ফিরে আসে কেন? কারণ হলো, মানুষ যখন কোন কাজ বেশি করে, তখন এমন অভ্যাস্ত হয় যে, বিনা চিন্তা-ভাবনায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার থেকে সে কাজ হয়ে থাকে।

তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায়, তার অন্তর উক্ত কাজের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে গেছে। এই সহজাত প্রভাব সমগোত্রীয় অন্যান্য কাজকেও আকৃষ্ট করে। হোক সে প্রভাব যত সুক্ষ্ম ও হালকা। নবী করীম (সা:) এর নিম্নোক্ত হাদীস এ বক্তব্যের সমর্থন করে:

"বিভ্রান্তির চিন্তা ও প্রবণতা মানুষের অন্তরকে মাদুরের বুননের মত ঘিরে নেয়। যে অন্তর তার প্রভাব গ্রহণ করে, তার উপর একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অন্যদিকে, যে অন্তর তা গ্রহণ করে না, তার উপর একটি সাদা দাগ পড়ে । দু' অন্তরের অবস্থা এই দাঁড়ায়. একটি সাদা মর্মরের মত ঝকঝকে ও তৈলাক্ত হয়ে যায়। ফলে তাতে আর কখনো কোন খারাপ প্রভাবের ক্ষতির আশংকা থাকে না। অপরটি এরূপ কালো বর্ণ ও পিচ্ছিল হয় যে, তাতে খেয়াল খুশীর চরিতার্থতা ছাড়া ভালোমন্দের কোন তারতম্য বোধই অবশিষ্ট থাকে না।"

এখন প্রশ্ন উঠে, কাজ কি করে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে? তার কারণ এই, মানবিক প্রকৃত্তি তথা অন্তর গোড়ার দিকে সাদা ও পরিচ্ছন্ন এক পাত্ররূপে তৈরী হয়। এরপর শক্তি তাকে চালিত করে কাজের দিকে এবং দিন দিন সে সেদিকে এগিয়ে চলে। এক্ষেত্রে তার প্রতিটি পশ্চাতের অবস্থা পরবর্তী অবস্থার কারণ হয় এবং কার্য সৃষ্টি করেই কারণ লোপ পায়। এ কার্য কারণ ব্রত ধারাবাহিক চলতে থাকে। কখনো তাতে আগেরটি পরে ও পরেরটি আগে আসার জো-নেই। তাই আজ যে অন্তর বর্তমান, তাতে অতীতের প্রতিটি কারণের প্রভাব বিদ্যমান। তবে- বাহ্যিক ব্যস্ততার কারণে অন্তরে তার পূর্ণ উপলব্দি থাকে না।

শুধু দুটি অবস্থাতে এ প্রভাব দূর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। (১) কার্য সৃষ্টির মূলে যে শক্তিটি সক্রিয়, যদি সেটা বিলুপ্ত হয় । (২) যদি উপর থেকে কোন (দৈব) প্রভাব এসে কারো বিশেষ প্রবণতাকে বৃদ্ধ ও রুগ্নের মতই বিলুপ্ত করে দেয়। এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয় ভালো কাজ মন্দ কাজকে বিলুপ্ত করে।" (সূরা হুদ, ১১৪)। তিনি আরও বলেন, "যদি তুমি শিরক্ কর, তোমার ভালো কাজ বরাদ্দ হবে।" (সূরা যুমার:৬৫)।

এখন প্রশ্ন উঠে, কাজগুলো কেন সুরক্ষিত রাখা হবে? জবাব এই, উর্ধ্বলোকের ব্যবস্থাপনার দান হিসাবে উন্নততর স্বরূপ জগতের স্তরে প্রত্যেকটি মানুষের আসলরূপ প্রকাশ পায়। আল্লাহকে প্রভু মেনে আসার কাহিনীতে যে সত্তারা উপস্থিত ছিল এরা তারাই। তারপর যখন সে সত্তা রূপ জগতে এসে দেহ ধারণ করে, তখন স্বরূপ ও রূপ যুক্ত ও একাত্ম হয়। তাই যখন কেউ ভালো কাজ করে, তখন তার স্বরূপ খুশীতে উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ স্বরূপের সাথে কাজটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। বিচার দিবসে দেখা যাবে কাজগুলো যত্নে সুরক্ষিত রয়েছে। আমলনামা পাঠের তাৎপর্য এটাই। কখনো দেখা যাবে, কাজগুলো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। হাত-পা সাক্ষী দেবার তাৎপর্য তাই।

কাজের আকৃতি ও প্রকৃতি তাদের পার্থিব ও অপার্থিব ফলাফল পূর্ণরূপে বলে দেবে। মানে, কাজগুলো দেখেই ফলাফল বুঝা যায়। ফেরেশতারা কখনো কাজের আকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টিতে দ্বিধান্বিত হয়ে বিলম্ব করে থাকে। তখন আল্লাহর ফরমান আসে, যা আছে তাই হুবহু চিত্রিত কর।

সৃষ্টি জগতে যা কিছু হয়েছে কিংবা হবে, সবই লওহে মাহফুজে এরূপভাবে অংকিত রয়েছে যা সাধারণ চোখে দেখার সাধ্য নেই। লওহে মাহফুজ লোহার পাত কিংবা কাঠ বা হাড়ের তক্তা নয়। এভাবে কিতাবে মুবিনকেও কাগজের কোন বই ভাববেন না। বরং আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর যেরূপ কোন তুলনা নেই, এ তক্তা ও গ্রন্থেরও তেমনি কোন তুলনা নেই। লওহে মাহফুজে সব বস্তুর আল্লাহ নির্ধারিত পরিমাপের রেকর্ড এমনভাবে লিখে রাখা হয়েছে যা লেখক ব্যতিত অন্য কেউ দেখতে পায় না। ভালা মন্দ কাজ মানুষের স্মরণে আসে এবং সে স্বভাবতই পুরষ্কারের আশা ও শাস্তির আশংকা রাখে। মানুষের আমল সুরক্ষিত রাখার পক্ষে এটিও একটি যুক্তি।

একাদশ অধ্যায়

শাস্তি ও পুরস্কারের কারণ

শাস্তি ও পুরস্কারের কারণ অনেক। তবে মূল কারণ দুটি।

(১)মানুষের বিবেক তার কোন মন্দ কাজ বা স্বভাবের প্রতি রুষ্ট থাকে। তার এরূপ বিরূপ অনুভূতি তাকে লজ্জিত ও আত্মগ্লাণিতে বিদগ্ধ করে। কোন কোন লোক যেভাবে ইলহামে অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করেন, তেমনি তার কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কেও ইলহামে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা রাখেন। সে অবস্থায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে ঘোষিত হয়, কাজের চিত্রটি তাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দাও। এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

"হ্যাঁ, যারা পাপ অর্জন করলো এবং স্খলন-পতন যাদের ঘিরে ফেললো, তারাই জাহান্নামের সহচর এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।" (সূরা বাক্বারাঃ ৮১)।

এই কারণটিই মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব ও কাজের ক্ষেত্রে অধিক প্রভাবশালী। সেটি মানুষের স্বভাব ও কাজকে কল্যাণময় ও ধ্বংসকর উভয়ই করতে পারে। তাই অধিকাংশ বিবেকবান জ্ঞানী-গুণী এটাই সমর্থন করেন। এই কারণটির একটি অন্তরায় হল মানুষের দুর্বল বিবেক ও কুপ্রবৃত্তি। এ অবস্থা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে মানুষ তখন পশুত্বের পর্যায়ে চলে যায়। তখন তার বিবেক অনুভূতিহীন হয়। কোন কিছুই তাকে ব্যথিত করে না। তাই তার দংশনও থাকে না। অত:পর যখন তার স্বভাব থেকে পশুত্বের প্রভাব দূর হয় ও সেখানে বিবেক মাথা উঠাতে থাকে, তখন তার দুঃখ দেখা দিয়ে থাকে।

(২) সর্বোচ্চ পরিষদের ফেরেশতারা মানুষের দিকে নিবিষ্ট থাকেন। সর্বোচ্চ পরিষদের সামনে মানবীয় প্রবৃত্তি, চরিত্র ও ভালো-মন্দ কাজের চিত্র মজুদ থাকে। তারা আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করেন, 'প্রভু! নেক বান্দাদের শান্তি ও বদ-চরিত্রদের শাস্তি দাও।' তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তখন শান্তি ও শাস্তি উভয়ই অবতীর্ণ হয়। এ থেকেই মানুষ সুখকর ও দুঃখদায়ক ঘটনার সম্মুখীন হয়। এ পথেই তারা তাদের সন্তোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন। কখনও সর্বোচ্চ পরিষদের অসন্তোষের প্রভাবে মানুষ অসুস্থ ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। কখনও তাঁদের সন্তোষের প্রভাব এসে মানুষের স্বভাবের দুর্বলতা দূর করে তাতে দৃঢ়তা এনে দেয়। এভাবে তাঁদের প্রভাবে ফেরেশতা ও মানুষ ভালো লোককে শান্তি দেয় ও মন্দ লোককে শাস্তি দেয়। কখনও মানুষের কৃতকর্মই অঘটন কিংবা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে তার শান্তি ও

শাস্তির কারণ হয়। যে মানুষকে আল্লাহ ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন, তাদের তিনি লাগামছাড়া হতে দিতে চান না। তাদের কাজের ভালো-মন্দ তিনি দেখবেন না - তা হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণের পক্ষে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী মজুদ আছে। "নিশ্চয় যারা কাফের ও কাফের থেকেই মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সবার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এ অভিসম্পাতে তারা চিরকাল কাটায় এবং এ শাস্তি তাদের কমে না আদৌ ও কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।" (সূরা বাক্বারা : ১৬০)।

উপর্যুক্ত দু'কারণের সংমিশ্রণে মানব প্রকৃতির যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে নানা ধরণের অদ্ভূত অদ্ভূত কারণ সৃষ্টি হয়। তবে দ্বিতীয় কারণটি দ্বারা এমন সব কাজ ও স্বভাব নিয়ন্ত্রিত হয় যেগুলো সামগ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। ফেরেশতা স্বভাব বা বিবেক যাদের পরিবর্তন ঘটায়। ফেরেশতা স্বভাব বা বিবেক যাদের দুর্বল, যারা পাপী তাদের স্বভাব ও কাজগুলোই এ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দ্বিতীয় কারণের প্রভাব ততক্ষণ মূলতবী থাকে যতক্ষণ তাদের উপর আল্লাহর আজাবের পথে অন্তরায় মজুদ থাকে। যখন তা দূর হয়ে নির্ধারিত সময় আসে তখন আজাবের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। আল্লাহর এ আয়াত তারই সাক্ষ্য বহন করে:

"প্রত্যেক জাতির বা দলের (পতনের) জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাদের সময় যখন এসে যাবে, তখন তার এক মুহূর্তও আগ-পিছ হবে না।" (সূরা আ'রাফ: ৩৪)।

সমাপ্ত